কালের কণ্ঠ

মো. গোলাম সামদানী ফকির ও ম. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া ▶

বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন এবং একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় চ্যালেঞ্জ

শৈশবে শিক্ষক মহোদয়ের কাছে প্রায়ই শুনতাম 'জ্ঞানই শক্তি'। এই প্রায় উচ্চারিত উক্তিটি বেদ বাক্যের মতো মন ও মগজে ধারণ করে বড় হয়ে উঠেছি। অথচ এতটা বছর পেরিয়ে এখনো অন্ধকার রাতে হারানো সুঁই খোঁজার মতো খুঁজে ফিরি এই অদৃশ্য শক্তিস্বরূপ জ্ঞান। মাঝেমধ্যে এই 'জ্ঞান' খাদ্য গ্রহণের মতো গ্রহণ করি বটে তবে তা অনেকাংশে হজম করতে পারি না। তাই তো বলি 'স্বাস্থ্য' কেবল খাদ্য গ্রহণের ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে তা হজমের ওপর। এখানে সহজেই অনুমেয়, আমরা শিক্ষার্থীদের আজ যা শেখাচ্ছি, সেই শিখন আগামীর কর্মক্ষেত্রের চাহিদা মোকাবিলায় কতটুকু প্রয়োজন তা এখনই ভাবতে হবে। পাঠকদের কাছে বিষয়টি সহজে বোধগম্য করার প্রয়াসে এ পর্যায়ে একটি উদাহরণের অবতারণা করতে চাই। লেখকদ্বয়ের একজনকে কলেজশিক্ষক যখন শর্টহ্যান্ড ও টাইপ শিখিয়েছিলেন, তখন কি সেই শিক্ষক একবারও ভেবেছিলেন ১০ বছর পর এই শিখন তার কর্মক্ষেত্রে আদৌ কাজে লাগবে কি না? প্রত্যুত্তর নিশ্চয়ই না। তাই প্রয়োজন শিক্ষকদের প্রণীত পাঠ্যক্রম ও তার নির্যাস বিশ্লেষণের সঙ্গে ভবিষ্যৎমুখী তথ্যের সন্নিবেশন নিশ্চিত করা; নচেৎ শিক্ষার্থীর আজকের এই অর্জিত জ্ঞান আগামী দিনের চাহিদা পূরণে অনেকাংশে ব্যর্থ হবে। এ ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পাঠ্যক্রম-ও শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক চর্চা ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় এটি একটি চ্যালেঞ্জ বটে।

গত অক্টোবরে কাতারে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইনোভেশন সামিট, ফর এডুকেশন-ওয়াইজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল, যেখানে শতাধিক দেশের প্রায় এক হাজার ২০০ শিক্ষাবিদ, করপোরেট, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। তিন দিনব্যাপী এই সামিটের মূল বিষয় ছিল 'জীবনের জন্য পুনরায় উদ্ভাবনী শিক্ষা', যা নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের আগামী শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে সৃষ্টিশীলতা, সহযোগিতামূলক কর্মোদ্যোগ ও অংশীদারে রূপান্তর করা যাবে, সেই উপায়টি খুঁজে বের করা, যাতে শিক্ষা শুধু ব্যক্তিক ও কর্মক্ষেত্রকেন্দ্রিক হবে না; হবে সমাজ ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। একুশ শতকের এই শিক্ষাব্যবস্থা হবে একজন শিক্ষার্থীর মানসিক, প্রজ্ঞা, সংবেদনশীলতা, নিজ দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধের সমন্বয়। এ ক্ষেত্রে ইউনেসকো প্রণীত 'ফোর পিলারস অব লার্নিং' নবতর ধারণাটি প্রাসঙ্গিকভাবে সামিট আলোচনায় চলে আসে। এ পর্যায়ে পাঠকদের সুবিধার্থে লার্নিং ফোর পিলারস বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দাবি রাখে, বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে সরাসরি জড়িত, তাঁদের জন্য। প্রথম পিলার : লার্নিং টু নো (জানার জন্য শিখন)। এই শিখন হবে তথ্যমুখী। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে তথ্যের সমাহার ঘটানো, যা তার পেশাগত ও সামাজিক জীবনে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এই শিখনের উপাদান হবে মূলত তিনটি; যথা গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়, সামাজিক ও জীবনদক্ষতার বিষয়াদি; যা বাস্তবিক সমস্যার সমাধানে গুণগত চিন্তার খোরাক জোগাবে। দ্বিতীয় পিলার : লার্নিং টু ডু (করার জন্য শিখন)। এই শিখন হবে প্রয়োগমুখী। শিখন হলো অর্জিত জ্ঞানের নির্যাস, যা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষার্থীর শিখন প্রয়োগের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় দক্ষতায়। এই দক্ষতা শুধু কর্মক্ষেত্রের জন্য নয়; হতে হবে ব্যক্তিক উদ্যোগ ও গুণাবলির উন্নয়ন, মনোবৃত্তির ইতিবাচক পরিবর্তন, মানানসই সামাজিক আচরণ ও ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতার ক্ষেত্রেও। ইউনেসকোর মতে, প্রথাগত শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু সত্যায়িত দক্ষতা প্রদান। আর তাদের উদ্ভাবনী শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিক সামর্থ্যকেন্দ্রী। যে সামর্থ্যের মধ্যে নিহিত থাকবে দক্ষতা ও প্রতিভার সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রিত সত্যায়িত দক্ষতা নিশ্চিত করবে শিক্ষার্থীর কৌশলগত, কারিগরি, সামাজিক আচরণ, ঝুঁকি গ্রহণ করার মানসিকতার দিক। এই শিক্ষার ভিশন হবে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীর জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি আগামী শিখন সমাজ গঠন। তৃতীয় পিলার : লার্নিং টু লিভ টুগেদার (একত্রে বসবাসের শিখন)। এই শিখন হবে সামাজিক মূল্যবোধমুখী; যা উৎসারিত হবে শিক্ষার্থীর হৃদয় থেকে। এর উদ্দেশ্য হবে সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য দূর, মানবাধিকার সুরক্ষা ও গণতন্ত্রায়ন, মানসম্পন্ন টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশের সুরক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই সব সামাজিক মূল্যবোধ চর্চায় ইতিবাচক মনোবৃত্তি গঠন। চতুর্থ পিলার : লার্নিং টু বি (পরিপূর্ণ হওয়ার শিখন)। এই শিখনের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখা; যেখানে ব্যক্তির অধিকার আদায় ও দায়িত্ববোধ পালনের মূল বিষয়; যথা শরীর ও মন, মেধা, সংবেদনশীলতা, ব্যক্তিক স্বতন্ত্রতা, কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিকতা, আত্মনির্ভরশীলতা, স্বাধীনতা, বিচার, সংকটপূর্ণ চিন্তা, সৃজনশীলতা ও মানুষের স্বাধীনতাসহ শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশের মাধ্যমে তাদের সামষ্টিক উন্নয়ন।

> চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর, বিশেষ করে শিক্ষকদের অন দ্য জব ও অফ দ্য জব প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, একজন শিক্ষক বা প্রশিক্ষক কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে এক ছটাক জ্ঞান শিক্ষার্থীকে তখনই দিতে পারবেন, যখন এই বিষয়ে একজন শিক্ষক বা প্রশিক্ষকের থাকবে ষোলো ছটাক জ্ঞান

বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদদের ধারণাপত্র উপস্থাপনের আলোকে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় পাঁচটি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়। এক. তথ্য ও প্রযুক্তি (আইটি) ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়ের সুনিশ্চিত করা। দুই. যোগাযোগ। বিশ্বায়নের এই সময়ে যোগাযোগ হবে মূলত প্রযুক্তিভিত্তিক; যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা। তিন. আন্তর্জাতিক ভাষাজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায়। চার. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে গড়ে উঠতে হবে একেকজন সৃজনশীল ও সংকটপূর্ণ চিন্তাবিদ, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে। পাঁচ. সামাজিক নেটওয়ার্কিং। তবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বাইরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর, বিশেষ করে শিক্ষকদের অন দ্য জব ও অফ দ্য জব প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে, একজন শিক্ষক বা প্রশিক্ষক কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে এক ছটাক জ্ঞান শিক্ষার্থীকে তখনই দিতে পারবেন, যখন এই বিষয়ে একজন শিক্ষক বা প্রশিক্ষকের থাকবে ষোলো ছটাক জ্ঞান। শিক্ষাগুরুর এই কথাটা আজ আমরা অস্বীকার করি কিভাবে!

লেখকদ্বয় : উপাচার্য, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং উন্নয়ন সাংবাদিক, প্রশিক্ষক ও সমাজকর্মী